এ প্রজন্মের শিল্পীরা

তন্ময় ব্যানার্জী

পার্থ দাশগুপ্ত --- (১৯৬৬ কোলকাতা)
দাদু আর এক দাদা মাটির কাজ করতেন। বাড়ীর সামান্য এই পরিবেশটুকু। বাকিটা বলা যায়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই পার্থর ছবি আঁকা শু। একেবারে ছোটোবেলা থেকে। তবে একটা ছোট্ট ঘটনাই নির্দিষ্ট করে দেয় তাঁর শিল্পীর জীবনকে। কলকাতার হালতুতে পার্থদের বাড়ীর পাশেই কাঁকুলিয়ায় থাকতেন সে যুগের নামজাদা শিল্পী শৈল চক্রবর্তী। যথারীতি পাড়ার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং তার বিচারকও শৈল চক্রবর্তী। সাপুড়ে এঁকে প্রথম হয়েছিল ১০ বছরের পার্থ। পুরস্কার নিতে গিয়ে শৈল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁর বাড়ী যাওয়া আসা। তখনকার দেব সাহিত্য কুটির, কিশলয়, ঠাকুমার ঝুলি থেকে শু করে সবেতেই শৈল চক্রবর্তীর সেই অসাধারণ ইলাট্রেশনগুলির অরিজিন্যালের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় ঘটে তখনই এবং ড্রয়িং সম্পর্কে এক সচেতনতা এবং ভালোলাগার জায়গাটি অজান্তেই সেই শিশু মনে এক অনুরণন সৃষ্টি করে। যার ছোঁয়া আজও পার্থর সমস্ত ধরনের কাজেই দেখতে পাওয়া যায়।

এইভাবেই চলতে থাকে ছবি আঁকা আর পড়াশুনা। ৮৬ সালে উচচমাধ্যমিক দিয়ে চাকরীর আশায় এয়ার ফোর্সে পরীক্ষা এবং চাকরির ডাক। কিন্তু ইতিমধ্যেই কোন এক পত্রিকায় কলকাতার সরকারি চা ও কাকলা মহাবিদ্যালয়ের ভর্তির পরীক্ষার বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যথারীতি---খোঁজ খবর নেওয়া শু। নিজের দাদা ভালো তবলা বাজান তিনি অনিল সেন মহাশয়ের সেতারের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। এই অনিলবাবুই আবার আর্টকলেজের শিক্ষক প্রয়াত শিল্পী বাঁধন দাশের বন্ধু। ব্যস্ - সেই শু, এয়ার ফোর্স এর চাকরিতে না গিয়ে আর্টকলেজের ভর্তির পরীক্ষার জন্য চুড়ান্ত প্রস্তুতি চলতে থাকে। যাদুঘরে মুর্তি স্টাড়ি, সারাদিন মাঠে ঘাটে স্কেচ আঁকা নিয়ে কেটে যায়। ৮৭-তে আর্টকলেজে চান্স। সেরামিক্ ডিপার্টমেন্ট আসা বাঁধন দাসেরই অনুপ্রেরণায়, ছাত্রকে পথটি চিনিয়ে দেওয়ার মত এমন শিক্ষক দু - এক জনই জন্মান। আর্টকলেজের সেরামিক বিভাগটিকে তিনি একাই মাত্র কয়েক বছরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পৌঁছে দেন, তাও নিজে পেন্টিং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক হয়ে । সেরামিক ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকের অভাব অথচ কি সম্ভাবনাময় হতে পারে এই বিভাগটি সেকথা ভেবে শেষ কয়েক বছর তিনি এক বিভাগেই শিক্ষক হয়ে ওঠেন।
এই কলেজের আর একজনের কথা পার্থ বলেন, তিনি গনেশ হালুই। অনেক শিক্ষকের মাঝে তাঁর উৎসাহ বেশ বল যোগাত। প্রথম দু-বছর গণেশ বাবুকে পেয়েছিলেন কম্পোজিশনের ক্লাসে। এরপর তিন বছরের জন্য নিজের ডিপার্টমেন্টে যেতে হত । থার্ড ইয়ারে উঠেই বাঁধন দাশকে মাষ্টারমশায় হিসেবে পান ওঁনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত ছাত্রছাত্রীদের। আর এভাবেই যে কোন ছাত্রের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয় কিভাবে আর কজের সঙ্গে নিজেদের অজান্তেই নিজেদের কিভাবে জড়িয়ে ফেলতে হয় তা জানতেন বাঁধন দাশ। আর তাই মাষ্টারমশাই বাঁধন দাশ প্রসঙ্গে পার্থ উচছ্বসিত। রাতের পর রাত জেগে তার ছাত্রদের সঙ্গে ফার্নেস চালানো, ছাত্রদের যাবতীয় অসুবিধা, আবদারে বিলিয়ে দেওয়াই স্যারের কাজ হয়ে পড়েছিল যেন ---বলেন পার্থ। দিনের পর দিন ওনার বাড়ীতে বসেও চলতো নিজেকে সমৃদ্ধ করার তোড়জোড় । তাই সেরামিকের মতো এক জটিল, রসায়ন বিজ্ঞান নির্ভর বিষয়কে এত সহজ করে শিল্পে প্রয়োগ এমন গুর কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন পার্থ। তবে এ প্রসঙ্গে আরো দুজনের ঋণের কথাও স্মরণ করতে ভুললেন না। তাঁরা হলেন যাদবপুর গ্লাস সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট এর অধ্যপকদ্বয় অজিত দত্ত এবং অমিতাভ কুমার। সেখানে পাঠ নিতে গিয়ে এঁদের কাছেই জানেন গ্লেজ্ এর নানা টেকনিক্যাল দিকের কথা।

সেরামিক সম্পর্কে ধারণা শুধু ভাঁড় আর ভাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বলা যায়---প্রায় গোটাদেশ জুড়েই। এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর উদার দৃষ্টিভঙ্গি পার্থের কাজ কে শুধু ব্যবহারোপযোগী আসবাব বা ঘর সাজানোর বস্তুতে সীমাবদ্ধ রাখেনি। সিরামিক আজ শিল্পের বৃহত্তর আঙিনায় নিজেকে প্রকাশের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম , সে খবর পার্থ রাখেন আর তার ফসল আমরা দেখতে পাই পার্থর কাজে। বাংলার সেরামিককে যে অল্প দু-একজন নতুন আলো দেখিয়েছেন তাদের কনিষ্ঠদের মধ্যে অবশ্যই পার্থর নাম রাখতে হঁবে।

ছবি আর ভাস্কর্যের মেলবন্ধনের সেতু হলো সিরামিক, পার্থর কথায়। তাই এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার অফুরন্ত সুযোগ। বডি তৈরী গ্লেজ ব্যবহার শুধু বই কেন্দ্রিক বাঁধা গতে হলে হবেনা, এ নিয়ে অনেক কিছু ভাববার আছে, করার আছে। হঠাৎ-ই সুযোগ আসে কিংবদন্তী শিল্পী কে. ভি. জেনার সঙ্গে ২০-২১ দিনের এক ওয়ার্কশপ করার। ১৯৯৬ -এ। তাঁর কাছেই শেখেন সিরামিক গ্লেজের আর এক পদ্ধতি রাকু। সেখানে ইলেকট্রিক ফার্ণেস এর প্রয়োজন নেই কাঠের আগুনেই সাধারণ ভাটিতে করা যায়। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এ ভাবেই ক্রমশ বিষয়টির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে এক সময় জোটে জাতীয় বৃত্তি, জুনিয়ার ফেলোশিপ, ললিতকলা রিসার্চ-গ্রান্ট এর মত সব সরকারী বেসরকারী বৃত্তি ও একক প্রদর্শনী, কিন্তু দুঃখ একটাই, তাঁর প্রিয় কলেজের সিরামিক্ ডিপার্টমেন্টের কি হবে, সরকারি কলেজ অথচ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেখানে কোনো শিক্ষক নিয়োগ নেই পার্কষ্ট্রিটের এই প্রাচীন লাল রঙের বাড়ীটায় (যেখানে গত প্রায় দেড়শ বছর ধরে ভারতবর্ষের সমকালীন শিল্পের ইতিহাস রচিত হচ্ছে) কি আছে কে জানে । এখানের কোন অভাব কোন অবহেলা পার্থর মতো অনেককেই দেখি বড় বেদনা দেয়। কিছুদিন আগে কলেজেরই এক অনুষ্ঠানে একদা এই কলেজেরই ছাত্র ও পরে অধ্যক্ষ বহু দেশ
ঘোরা প্রবীণ এক শিল্পী বলেছিলেন যখন এখানে আসি মনে হয় যেন মায়ের কাছে এলাম,--- তাই-ই হয়তো.....।

অখিল চন্দ্র দাশ (১৯৬৮ -কলকাতা) ঃ
ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাস মানেই ভাস্কর্যের ইতিসাস। আর সব থেকে আশর্চ্য আজকে সেই বিষয়টিতেই আমরা অনেকটা পেছনে হাঁটছি। এর মূল কারণ যে শুধু যোগ্য শিল্পীর অভাব তা নয়, এখনো সাধারণ মানুষের কাছে মূর্তি বলতে প্রতিমা শিল্পকেই ভাবায়। ভাস্কর্য সম্পর্কে তেমন কোন দায় কেউই পালন করেননি যা দিয়ে আরো বেশীসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। তাদের বোঝানো যায় তার নান্দনিকতা, আর পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় ভারতবর্ষের সেই সম্পদের সঙ্গে। যেহেতু ভাস্কর্যের পরিধি এত বিশাল এব আকারগত, মাধ্যমগত ও উপস্থাপনার দিক দিয়ে সে এমন জায়গায় এসে আজ দাঁড়িয়েছে যা বুঝতে গেলে বা ভালো লাগতে গেলে এক পরিশীলিত মন এবং অনেক দেখার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন । তবু এরই ভেতর শিখে চর্চা তো আর থেমে থাকতে পারে না। সে চলবে তার নিজের নিয়মেই। বহু প্রতিভাবান শিল্পী এই বাংলায় এসেছেন । তাঁরা কেউ কেউ এখানে কাজ করছেন। সমৃদ্ধ করে চলেছেন আমাদের সমসাময়িক ভাস্কর্য শিল্পকে। আর সেই ধারা বেয়েই এখনকার বেশ কয়েকজন তণ শিল্পী উঠে এসেছেন তাদের নিজ যোগ্যতায় প্রচারের আড়াল থেকেই। তেমনি একজন তণতম প্রজন্মের ভাস্কর অখিল দাশ।
বেহালায় অমরদার কাছে ছোটোবেলায় হাতেখড়ি ছবি আঁকার। বড় হয়ে গভঃ আর্টকলেজের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখান থেকে ১৯৯০ -এ ভাস্কর্য বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী নিয়ে পাশ করে বেরোলেন। কলেজে মাষ্টামশাই বলতে হারানবাবুর (হারানচন্দ্র ঘোষ) কথাই বিশেষ করে বলেন অখিল। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন অফুরন্ত উৎসাহ । ফাইনাল ইয়ারে উঠে সিনিয়র কয়েকজন ভাস্কর বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়। যাঁরা এই কলেজ থেকে পাশ করে বরোদা থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন। সন্দীপ চত্রবর্তী মুকুলেন্দু পাঠক, সুমিতাভ পালের উৎসাহে এবং অনুপ্রেরণায় অখিল ঠিক করেন বরোদা থেকেই ভাস্কর্যে মাষ্টার ডিগ্রী করবেন। যথারীতি বরোদায় পড়ারও সুযোগ হয়ে যায়। আর সেখানেই ভাস্কর্য সম্পর্কে ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। এই প্রথম বৃহত্তর দুনিয়ায় পা বাড়িয়ে সব দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। দু বছরের প্রথম বছর কোন কাজই করে উঠতে পারেন নি।

মাষ্টারমশাই রাঘব কানারিয়ার কথা এ প্রসঙ্গে বারবার মনে করেন। তিনি কোনদিন হাতে ধরে কাজ শেখাননি---বললেন অখিল । কাজ করে যাও, তোমার পথ তুমি নিজেই খুঁজে পাবে ----এমনটাই বলতেন মাষ্টারমশাই । এই কথাগুলিই অখিলকে আজও কাজ করার পেছনে শক্তি জোগায়। বরোদায় শেষ এক বছর বেশ কিছু ব্রোঞ্জে কাজ করেছিলেন। ছাগল নিয়ে অনেকগুলি কাজ করেছিলেন এইসময়, পরে আস্তে আস্তে অন্য মাধ্যম যোগ হতে লাগল ব্রোঞ্জের সঙ্গে, বিশেষ করে কাঠ।

এরপর ওখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে আবার কলকাতায়। এখানে ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন এই মিশ্রমাধ্যমে। এবং এ সকল কাজের জন্য পেয়েছিলেন ললিতকলা রিসার্চ গ্রান্ট, ন্যাশানাল স্কলারশিপ, জুনিয়র ফেলোশিপ এবং হারমোনি এ্যাওয়ার্ডের মতো বহু সরকারী ও বেসরকারী সম্মান। ক্রমশ রাঘব কানারিয়ার কথা ফলতে শু করল। কাজ করতে করতে নিজেরই অজান্তে চলে আসতে লাগল কত রকমের ফর্ম, কতরকমের বিষয়বস্তু এবং তাদের উপস্থাপনার নানা রকমফের।
রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তাভাবনা থেকে মূলত উঠে আসতে লাগল সেসব কাজগুলি। শক্তি ও তার অপব্যবহার, সামাজিক জীবনে মানুষের দোদুল্যমান অবস্থা, অসহায়তা, তাদের নানা রকম কু-সংস্কার --এ সমস্ত বিষয় ভাবনা চলতে থাকল। তার কাজের ভেতর তাই ভারসাম্য, কৌণিক বিন্দু ঝুলন্ত অবস্থা --এসব ব্যাপারগুলির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর কাজে আর্টকলেজের বিশেষ এই দিকটি অর্থাৎ প্রাথমিক জ্ঞানটুকু এমনভাবে তৈরী করে দেওয়া হয় যাতে তার সৃষ্টিকর্মের ভেতর দুর্বলতা না থেকে যায়। অখিলের সমস্ত কাজের ভেতর এই সবলতার ছাপ থাকে। ফলে বিষয়বস্তু তার জোরালো আবেদন রাখতে সমর্থ হয় সাধারণ দর্শকের সামনেও। তাঁর চারপাশের জগৎ নিয়ে তৈরী হয় নিজের ভাস্কর্য জগৎ। চারপাশের এই অশুভ শক্তির (তা সে রাজনৈতিকও হতে পারে) দাপাদাপি চোখের সামনেই ঘটে চলে, একটি কাজে তার প্রকাশ এইভাবে, নীচে কতগুলি অতি সাধারণ মানুষের সারি, তার ওপর ত্রিশুল হাতে দাড়িয়ে এক মুন্ডহীন মনুষ্য মুর্তি। আর একটি কাজে একটি চোঙাকার বস্তু ওপরদিকে এক তীক্ষ্ণ বিন্দুতে মিলেছে। তাকে ঘিরে গোল করে দাঁড়িয়ে কিছু মনুষ্যমুর্তি। এই ভাবে দর্শককেও কাজের অঙ্গ করে তোলেন অখিল তাঁর কর্মের উপস্থাপনার গুণে। কোথাও বা একদল মানুষ বয়ে নিয়েচলেছে জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশিচক্রের সিম্বল গুলি। একটি কাঠের প্যানেলে খোদাই করা রাশিচক্রের ছবি কাঁধে করে নিয়ে চলেছে কিছু মানুষ। মানুষগুলি ব্রোঞ্জে করা। তারা কি তাদের ভাগ্য বয়ে নিয়ে চলেছে না কি কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চলেছে ।

কাজগুলি যেন শুধু নিছক শিল্পবস্তু না হয়ে ওঠে, তারা যেন সাধারণ দর্শকদের আনন্দ দিতে পারে---এ চিন্তা অখিল সবসময়ই করে থাকেন। তাঁর কাজে প্রচুর অলঙ্করণ (ডেকরেটিভ মমেন্টস) থাকে। থাকে স্থাপত্য ধর্মিতাও। খুব বেশী ভাঙ্গাচোরায় তিনি যান না। মানুষ মানুষ হয়েই হাজির হয় আমাদের সামনে। তাঁর কাজে পার্সপেকটিভ দেখার মতো। ভাস্কর্যেও তিনি দূরত্বকে ধরেন অনায়াসে ফলে কাজে একধরনের নাটকীয়তা তৈরী হয় যা তাঁর একান্ত নিজস্ব।

অতি সাধারণ এক পরিবার থেকে পরিশ্রম আর মেধার গুণে অখিল আজ কলকাতার সরকারী আর্টকলেজের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। সেখানেও তিনি একজন সৎ ও পরিশ্রমী শিক্ষক হিসেবে সকল ছাত্রেরই প্রিয়। আমরা অপেক্ষা করব তাঁর আগামী দিনগুলির জন্য, যেখানে শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি রচনা হবে।

কুশলকান্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ--- (১৯৬০, চন্দননগর)
বাবা নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি জেলে বসে রামকৃষ্ণদেবের ছবি এঁকেছিলেন। মাও ভালো আঁকতেন। এইভাবে ছোটোবেলা থেকে কুশল পরিচিত হয়েছিলেন ছবি আঁকার সঙ্গে। তার পরে আর্টকলেজগুলোতে পরীক্ষা দেওয়া এবং ইন্ডিয়ান আর্টকলেজে ভর্তি হওয়া । বরাবর ক্লাসের সেরা ছাত্রটি হয়েই কলেজ থেকে পাশ

করেছিলেন। কলেজে গু হিসেবে তেমন কারোকেই পাননি। তখন ইন্ডিয়ান আর্টকলেজের টালমাটাল অবস্থা। শিক্ষক নেই, ক্লাস সব হয় না। কিছুই ঠিকঠাক শেখা হয় না। তবুও এর মধ্যেই ত্রিদিববাবুর কাছথেকে পেয়ে ছিলেন ছবি স ম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বের কিছুটা । অয়েল-পেন্টিং থেকে ম্যুরাল সবই শিখেছিলেন তাঁর কাছে। আর একজনের কথা স্বীকার করেন কুশল। তিনি হরিলাল সাউ। পেনসিলের কাজ, পোট্রেট খুব যত্ন করে শিখিয়েছিলেন উনি।

এরপর কলেজ থেকে বেরিয়ে চার-পাঁচজনের এক গ্রুপ স্ট্রোকপেন্টার্স গঠন করেন। সারাদিন ছবি আঁকা কখনো সখনো কিছু আর্ডারি কাজ পয়সা রোজগারের জন্য চলতে থাকে। ৮৯ সালে কলকাতায় অ্যাকাদেমি অব ফাইনআর্টস-এ প্রথম গ্রুপ এগজিবিশন, সেখানে মূলত কুশলের ছিল মিশ্র মাধ্যমের ছবি করার চেষ্টা তারপরে কখনো গ্রুপের সঙ্গে কখনো কখনো এককভাবে দিল্লী, বোম্বে, কলকাতায় নিয়মিত প্রদর্শনী হয়ে চলল। এরই মাঝে দিল্লীতে হার্মিটেজ ও ল্যুবর-মিউজিয়ামের কিছু ছবির প্রদর্শনী হয়ে যায়। সেখানে ভ্যন গগ্, রেমব্রান্টের অরিজিন্যাল ছবি দেখেন। যা এতদিন ধরে বইয়ের পাতায় দেখা, চোখের সামনে সে সব ছবি দেখে বিহ্বল হয় পড়তে হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আস্বাদন করার মতো অবস্থা হয়েছিল সদ্যপাশ করা তণ শিল্পী কুশলের।

এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রিয় শিল্পীদের নাম জানালেন ---মাতিস, সেজান আর অবশ্যই রেমব্রান্ট। তবে আমাদের নন্দলাল, অবনঠাকুর রামকিংকর---একই রকম ভালো। তিনি এও স্বীকার করেন আধুনিক শিল্পে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের মেনে নিতেই হবে। তিনি ছাড়া এরকম ছবি আঁকার সাহস ভারতীয় শিল্পীরা বোধহয় পেতেন না।

এখানকার শিল্পীদের ভেতর তাঁর পছন্দের তালিকায় রামনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ রামচন্দ্রন, গনেশ পাইন। নিজের ছবিতে ম ানিদার প্রভাব স্বীকার করেন। তাঁর নিজের শিল্প ভাবনা প্রসঙ্গে জানান বারবার স্বাভাবিক নিয়মেই বদলেছে তাঁর ছবি। চিন্তাভাবনার জগৎ যেমন পাল্টেছে, পাল্টেছে মাধ্যমও, সমান্তরাল ভাবেই । প্রথম দিকের নানা জটিল ভাবনা আস্তে অ াস্তে সরল হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রগুলি এক্ষেত্রে দান প্রভাব ফেলে শিল্পীকে। একসময় শুধুই নারী ও প্রকৃতি । তারপর শুধুই প্রকৃতি । প্রকৃতির অনেক বিষয় একসঙ্গে কখনো বা একটি বিশেষ কিছু। যেমন গোটা পট জুটে গে ায়াল পাড়া। আবার কখনো বা নারীর মুখ, পদ্মফুল---এইসব। ছবি গুলো কাঁচের ওপর তেলরং ত্র্যাত্রিলিক দিয়ে। এই পদ্মের ডাঁটি বা পদ্মফুল সম্পর্কে শিল্পীর একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা কাজ করে। কোন এক প্রদর্শনীতে এক দর্শক কথা প্রসঙ্গে শিল্পীকে বলেন---- পদ্মের সৌন্দর্য তো দেখেছো কিন্তু কখনো ভেবেছো কি , তার নিচে থাকে এক লম্বাডাঁটি। সে এমন কি নিয়ে সেই নলের ভেতর দিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে উপরের এ অপার সৌন্দর্য । সে কি শুধুই কিছু জৈব উপাদানের মিশ্রণ না আরো কিছু ---এরপর থেকেই ছবি এক বিশেষ দিকে মোড় নেয় যা শুধু তন্ত্র নয় আবার তন্ত্রকে ব াদ দিয়েও নয়। এই সব বিষয় আর তার প্রতীকীরূপ নিয়ে অজস্র ছবি যা মূলত ড্রয়িং হয়ে উঠে আসে কাগজে । মাধ্যমে প্রধানত ড্রাই-প্যাস্টেল, চারকোল। যেহেতু ড্রয়িং -ই তার সবথেকে প্রিয় তাই এখনো প্রতিদিনই নানা মাপের কাগজে, অসংখ্য ড্রয়িং চলতে থাকে অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকেও, অত্যন্ত সাবলীলরেখা সংঘবদ্ধ রচনার (কম্পোজিশন) গুণে ড্রয়িংগুলিতে পিকটোরিয়াল কোয়ালিটি উপভোগ করার মতো। নানা রকমের আকার বা ফর্ম স্বতঃস্ফুর্তভাবে তৈরী হতে থাকে। জ্যামিতিক আকারকে আশ্রয় করে বেরিয়ে আসে দেহজ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জিহ্বা, বিভিন্ন গ্রন্থি , যা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার কথা, অনুভূতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পীর এক প্রিয় বিষয় চোখ। ছবিতে এই চোখ নানাভাবে এসেছে। আর এসেছে সেই প্রাণশক্তি যা পদ্মফুলের নালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত । তাঁর ছবিতে ডট চিহ্নগুলি এই প্রবহমান চলৎশক্তির কথাই বলে, আর ছবিকেও তার স্থবিরতা কাটিয়ে গতিশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। শিল্পীর বর্তমান কর্মস্থল দিল্লী। মেট্রোপলিটন শহরের অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা ছবি হয়ে ওঠে এখন ক্যানভাসে। সমস্ত পটজুড়ে টুকরো, টুকরো করে সাজানো ---এই টুকরো - টুকরো সমাজ জীবন। এই সব। কুশল বলেন এখন আর জোর করে ছবি করতে হয় না। জায়গা বদলে যায়, জীবন পাল্টে যায়, ছবিও হয়ে ওঠে তার মতো করে। সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ কুশলের একার জীবনে ছবিই তাঁর একমাত্র ভালোবাসা, তাই দুজনেই দুজনের কথা ভালোই বোঝেন এখন।

কলেজস্ট্রিট পত্রিকায় প্রকাশিত